Website: https://www.parthasarathipatrika.com

৭২তম অন্তর্জাল সংখ্যা
৯ই চৈত্র , ১৪৩২ / *24.03.2026*

-: সম্পাদক :-

সু ন ন্দ ন ঘো ষ

: সূচীপত্র :-

(৭২তম অন্তর্জাল সংখ্যা)

শতবর্ষের দিনে	শ্রী সুনন্দন ঘোষ
প্রীতি-কণা	শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ
আত্মকথা	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
ভারত-আবিষ্কার	শ্রী পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য
যোগবাণী	পরমহংস যোগানন্দ গিরি
গোদাবরীর ডাক শুনে	শ্রী অরূপ কুমার ভট্টাচার্য

Founded by Sri Priti Kumar Ghosh in June, 1960, PARTHASARATHI Bengali Monthly Magazine, RNI 5158/ 60, published in print format for sixty years, thereafter converted to e-magazine by Sri Sunandan Ghosh, Editor & Publisher in April, 2020 during prolonged Nationwide Lockdown and to be published in the Website: https://www.parthasarathipatrika.com

Contact: 182 Jessore Road, Flat- D/1, Kolkata- 700074. WhatsApp: 8910977590.

(আবির্ভাবঃ ১০ই মার্চ, ১৯২৬ – তিরোভাবঃ ২৪শে নভেম্বর, ১৯৮৬)

শতবর্ষের দিনে **সুনন্দন ঘোষ**

১০ই মার্চ, ২০২৬- এ শতবর্ষ পূর্ণ করলেন শ্রীপ্রীতিকুমার। ১৯২৬ সালের ১০ই মার্চ যে যাত্রা শুরু হয়েছিল তাঁর, মাত্র ৬০ বছর বয়সে অপ্রত্যাশিত ভাবে তার বিরতি ঘটে ২৪শে নভেম্বর, ১৯৮৬ তে । স্বল্প দৈর্ঘ্যের এই যাত্রায় তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনার সুরভি আবিষ্ট করেছিল সমাজের বিভিন্ন প্রান্তের অগণিত মানুষকে। তিন প্রজন্ম পরেও সেই মানুষদের উত্তরসূরিরা আজও তাঁর স্মরণ মননে নিবেদিতপ্রাণ।

এই বিশেষ দিনকে স্মরণীয় করে রাখতে বিশেষ অনুষ্ঠান সংগঠিত করা যায়নি কিছু ব্যক্তিগত সমস্যায়। কাউকে বিশেষ আমন্ত্রণ জানানো হয় নি। তবু সবাই এসেছিলেন, যেমন আসেন প্রতি বছর। তাঁদের গৃহের দেবতার আসনে শ্রীপ্রীতিকুমার, তাদের বিপদে সম্পদে রাগে অনুরাগে শ্রীপ্রীতিকুমার। তাঁরা নিজেরাই আসেন ফুল মালা উপহার নিয়ে।

শ্রীপ্রীতিকুমারের ছোট ভাই প্রভাতকুমার, যাঁর নিজের বয়স ৯০ বছর, অত্যন্ত অসুস্থতা সত্ত্বেও মেয়ে পাপিয়ার হাত ধরে চলে এসেছিলেন সকাল বেলা। অশক্ত শরীর নিয়ে এসেছিলেন সোমার মা মীরাদেবী। সন্ধ্যায় এলেন ছোটোদি ও ব্যোমকেশদা। সপরিবারে এল অপুদা, বাপ্পা। শ্রীপ্রীতিকুমারের জীবৎকালে যাঁরা তাঁর সহযোগী ছিলেন – তাঁরা অধিকাংশই এখন অন্যলোকে। সম্পর্কের বন্ধন অটুট রেখেছেন তাঁদের পরের প্রজন্ম। শ্রীপ্রীতিকুমার ছিলেন তাঁদের জ্যেঠু, মামা, চিনিমামা, চিনিদাদু, দাদুমণি, সাধুজী, পণ্ডিতজী। এঁরা প্রণাম করতে আসেন ১০ই মার্চ, ২৪শে নভেম্বর, বিজয়া দশমীর দিনগুলোতে। সাথে এসেছিলেন তাদের সন্ততিরা যাদের হৃদয়ে বিশ্বাসের বীজ বুনেছেন তাদের পূর্বজেরা। নির্ভরতা নিয়ে এই বাড়িতেই বেড়ে উঠেছে বাচেন্দ্রী।

শ্রীপ্রীতিকুমারের শেষ বছরগুলি কেটেছিল নাগেরবাজারের এই ফ্ল্যাটে। অনেকের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই ঘরের সঙ্গে। এক সময় আমার মায়ের

গলায় গমগম করত সারা বাড়ি। আবার সোমার অতিথি আপ্যায়ন বরাবরই নীরবে। সকলের পারস্পরিক কুশল বিনিময়ের পালা মিটে গেলে নিজেদের অজান্তেই শুরু হয়ে যায় ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ - জ্যেঠুর কথা, মামার কথা, দাদুর কথা। এবারেও তাই হল। আনুষ্ঠানিক তত্ত্বের জড়তা নয়, ব্যক্তিগত অনুভূতির সহজ সাবলীল স্মৃতিচারণ। যতবার শোনা যায়, প্রতিবারই নতুন লাগে।

পূর্ব প্রস্তুতি না থাকলেও অনুরাগীজনের সমবেত উদ্যমে শুরু হল অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান। আবৃত্তি করলো ঋষভ। রিমির পরিশীলিত কণ্ঠে শুরু হল গান। তুমি বন্ধু তুমি নাথ, আমি অকৃতি অধম বলেও তো কিছু, জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ। যখন রিমি গাইছে 'গুরুদেব দয়া করো দীন জনে' - তার নিজস্ব অনুপ্রেরণা হঠাৎ হয়ে গেল সমবেত প্রার্থনা সঙ্গীত। সকলেই গলা মিলিয়েছে তার সুরে - মিঠু, সুমিতা দি, মিতালী বৌদি, মলি বৌদি, দোলন। অনেকেরই চোখে জল। কয়েক মুহূর্তের জন্য দৈনন্দিন জীবনের গ্লানির উর্দ্ধে উঠে অপার্থিব করুণাকে স্পর্শ করছে সবাই।

শতাব্দীর দীর্ঘ পথ পার হয়েও আজও প্রাসঙ্গিক শ্রীপ্রীতিকুমার। নিত্যনতুন ব্যক্তিগত, পারিপার্শ্বিক সমস্যার মধ্যেও কি করে যেন পার্থসারথি প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়ে চলেছে শুধুমাত্র তাঁরই কৃপায়। বহু জন আজও পথ খোঁজেন তাঁর প্রীতি-কণার মাধ্যমে।

সার্থক সেই জীবন যা শতবর্ষের ব্যবধান অতিক্রম করেও মানুষকে দিচ্ছে উত্তরণের আশ্বাস, ধন্য আমরা যারা প্রতি দিন অবগাহন করছি অহৈতুকী ভালোবাসার ঝর্ণা ধারায়।

জয়তু শ্রীপ্রীতিকুমার! **জয়তু পার্থসারথি!**

জন্মদিনে বাণী **শ্রীপ্রীতিকুমার**

(২৬শে ফাল্গুন, ১৩৮০ সাল)

আজকের এই শুভ দিনে আমার জীবনে আপনাদের সকলের আশীর্বাদ কামনা করি। সেই সঙ্গে আমার অধ্যাত্ম ও ধর্মজীবনের পূর্ণতা সাধনে আপনাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং সহায়তাও কামনা করি।

পূর্ব নির্ধারিত বিধান অনুসারে ঈশ্বরের ইচ্ছায় এবং তাঁর লীলায় সহায়তা করবার জন্য আমরা আগেও যেমন মিলিত হয়েছিলাম, এজন্মেও পুনরায় সম্মিলিত ও গোষ্ঠীবদ্ধ হয়েছি।

শ্রী রামকৃষ্ণদেব বলতেন – কলমির দলের এক জায়গায় টান দিলে চারদিক হ'তে তার লতাপাতার দল জড়ো হয়।

পূর্বে আমাদের সংযোগ ছিল, তাই এজন্মেও আমরা আবার একত্রিত হয়েছি। বিগত জন্ম-জন্মান্তরে তাঁর যেটুকু কর্ম অসম্পূর্ণ ছিল, এজন্মে সেই দিব্য কর্মে পূর্ণতা আনবার জন্যই আবার আমরা মিলিত হয়েছি। এই জন্মেই আমাদের সেই কর্মের পরিসমাপ্তি ঘটাতে হবে।

সকলেই যে ব্যক্তিগত ভাবে সাধন-ভজন করতে পারছেন বা পারবেন, তা নয়। কিন্তু আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক দেখা-সাক্ষাৎ, মেলা-মেশা, আলাপন, আদান-প্রদান – এগুলির মাধ্যমে যে শাশ্বত স্পন্দন ও স্ফূরণ ঘটছে, তাতেই আমরা সেই পরমের নিকটবর্তী হচ্ছি অতি সহজে।

আমাদের নিরাশ হবার কোনও কারণ নেই। জীবনে ঘাত-প্রতিঘাত, দুঃখ-ব্যথার যতই সঙ্ঘাত আসুক না কেন, তা আমাদের মনকে সাময়িক ভাবে স্পর্শ করলেও আত্মা প্রাণ ও হৃদয়কে কখনও স্পর্শ করে না। এঁরা পূর্ণভাবেই সর্বদা যুক্ত আছেন তাঁর সাথে। জ্ঞাত বা অজ্ঞাত – যে ভাবেই হোক, তিনি আমাদের তাঁর কাছে নিয়ে চলেছেন।

আমরা তাঁরই, তিনি আমাদেরই।

জয়তু পার্থসারথি!

আত্ম-কথা **শুক্লা ঘোষ**

আজকাল আমার লেখার অভ্যাসটা একেবারেই চলে গেছে। প্রেস থেকে তাগাদা আসে বই ছাপা হয়ে গেছে – আমার লেখাটা যেন দেওয়া হয়। আমি তারপর লিখতে বসি। লেখবার আর কিইবা আছে। সেই তো - "রাঁধার পর খাওয়া আর খাওয়ার পর রাঁধা-"। আমি তো চিরাচরিত নিয়মের মধ্যেই বাস করি। আমার মতো সাধারণ জীবনে আর কি পরিবর্তনই বা হতে পারে?। পরিবর্তন হত শ্রীপ্রীতিকুমারের উপস্থিতিতে। কত বিচিত্র চরিত্র যে দেখতাম নিত্য, তার ঠিক নেই। অসংখ্য পুরুষ ও মহিলা তাঁর কাছে আসতেন। সবার জীবন নিয়ে আলোচনা করলে কত যে ছোট গল্প হয়ে যেত লেখা! খুব অল্প বয়সে আমি কলম ধরেছিলাম। আমার মনে আছে এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করেছিলেন শ্রীআশীষ বসু। পরে তিনি খ্যাতনামা সাংবাদিক হয়েছিলেন। বাড়ী ছিল মাহেশে। যশোহর থেকে ফেরবার পথে আমার মায়ের সাথে তাঁর আলাপ হয়েছিল। সেই সময়ে আমাদের বাড়ীতে খুবই আসতেন। আমার মায়ের বাংলা সাহিত্যের উপর খুব ভালো দখল ছিল। কি অপূর্ব আবৃত্তি করতেন রবীন্দ্রনাথের কবিতা। আমার কানে আজও বেজে ওঠে সেই গলা-

"আজি এ প্রভাতে রবির কর।"

আমার দাদারও বাংলা ভাষায় ভালো জ্ঞান ছিল। পরবর্তী কালে সব যেন কেমন করে একাকার হয়ে গেল। আগে প্রায়ই আশীষদার নাম দেখতাম খবরের কাগজে। সেই আশীষদার নাম আর কাগজে দেখিনা। তিনি আছেন কিনা বা কোথায় আছেন খুব জানতে ইচ্ছে করে।

মানুষের জীবন থেকে একটি একটি চরিত্র কেমন করে যেন হারিয়ে যায়। স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা যাদের সঙ্গে দিয়েছিলাম তাদের বেশীরভাগ নাম আমি ভুলে গেছি, ভুলে গেছি মুখ গুলিও। তাঁরাও আর আমাকে দেখলেও চিনতে পাররেন না। কারণ তখনকার থেকে আমার ওজন নিশ্চয়ই চতুর্গুণ বেশী হয়েছে। নড়াচড়া করতে কষ্ট হলে আমি নিজেই নিজেকে চিনতে পারিনা। রবীন্দ্র ভারতীতে Music নিয়ে দু

বছর পড়েছিলাম। তখন বাংলা সাহিত্যে কিছু গবেষণা শুরু করেছিলাম। শ্রীপ্রীতিকুমারের এসব বিষয়ে খুবই উৎসাহ ছিল। তিনি আমার পড়াশুনা করবার সময়ে ছেলের দায় বা সংসারের দায়িত্ব নিজেই পালন করতেন। বিটকেলেমী আমারও কম ছিল না। সারা বছর না পড়ে পরীক্ষার আগের রাত্রে পাঠ সাঙ্গ করবার অভ্যাস ছিল আমার। আমি যতক্ষণ পড়তাম, শ্রীপ্রীতিকুমার জেগে থাকতেন। আমার বায়না ছিল আমি একা জাগব কেন? যাইহোক ডঃ সাধন ভট্টাচার্য্যের অধীনে কাজ করতে শুরু করলাম। গদ্য সাহিত্য নিয়ে কাজ করছিলাম। হঠাৎ এক দিন ডঃ সাধন ভট্টাচার্য্য ইহলোক ত্যাগ করলেন। শ্রীপ্রীতিকুমারের কি রসিকতা! আমার মত ফাঁকিবাজ ছাত্রীর হাত থেকে ডঃ ভট্টাচার্য্য রক্ষা পেলেন, এই ছিল শ্রীপ্রীতিকুমারের বক্তব্য।

তার অনেক পরে মঙ্গলকাব্যের উপর পড়াশুনা করব বলে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে যাতায়াত করেছি, কিন্তু সেখানেও তখন নৈরাজ্য চলছে। তাই আমাকে পশ্চাদপসরণ করতে হয়েছে। ঠিক করেছি আর চার বছর পর অবসর গ্রহণ করবার পর সাহিত্য নিয়ে বসব। তখন অন্ততঃ কেউ বলবে না চাকরীর ভবিষ্যত ভেবে এসব করছি। এখন অবশ্য আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভবও নয়। আমার একটা প্রধান দায়িত্ব হোল বাচেন্দ্রীকে দেখভাল করবার। অনেকেই আমাকে বলেন, "আবার জড়াচ্ছ? আবার মায়া বাড়ছে" - ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার বক্তব্য হোল আমি তো সংসারে আছি। শ্রীপ্রীতিকুমার বাপীর প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "পুকুরের জল ভাগ করা যায় না।" বারবার কথাটা বলেছিলেন। এখনও সেই কথাই মনে করি। সমঝোতা করে চলবার ব্যবস্থা হয়। রাগ হলে বিশোর তো আছেই। ওর কাছে গেলে মলির নির্ভরতা ও কিশোরের আনন্দ আমাকে অনেক শান্ত করে। আমি ঈশ্বরের কাছে সদাসর্বদা প্রার্থনা করি কিশোর সুস্থ থাকুক। কিশোর রোগের যন্ত্রণায় যেন কষ্ট না পায়। এখন তো আর সেদিন নেই যে একজনের অসুখ আরেকজনের দেহে transfer হয়ে যাবে! তাই যার যার ব্যথা তাকেই বইতে হয়। আমার বিশ্বাস কখনও

কখনও ভক্তের আকুলতায় ভগবানও হার মানেন। আর এই বিশ্বাস আছে বলেই আমরা বেঁচে আছি।

বাপীর কাছে শুনেছিলাম অনেকে আমার লেখা পড়ে আমাকে খুব নিঃসঙ্গ মনে করে সহানুভূতি জানাচ্ছেন। আরে, নিঃসঙ্গ তো আমি হয়েইছি। রাগ হলে দুঃখ বোধ করলে নালিশ জানাবার পর তার উপসংহার জানবার তো আর কোনও উপায় নেই। সেই লোকটি খাটে শুয়ে থাকলে বলতাম – "ওকে একটু জব্দ করে দেওয়া হোক, ওকে নাকানি চোবানি খাওয়াক --" ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন তো তা বলা যায় না। ঈশ্বরের কাছে কখনও কারও খারাপ চাইতে নেই। তাই সকলের ভালো চাইতে চাইতে, যার উপর রাগ করি তারও ভালো চেয়ে ফেলি।

ভালো লোকের সঙ্গ করা খুব বিপদ। এমন কতকগুলি ভালো শিক্ষা দিয়ে বসেন যে সেখান থেকে আর ফেরা যায় না। একটা জিনিষ খুব ভালো করে বুঝেছি যে ঈশ্বর কোনও কষ্টকেই দীর্ঘস্থায়ী করেন না। তবে যখন কষ্ট দেন, তা সহ্য করা যে কি দুরূহ তা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ জানেন না।

অনেক আগে থেকে আমাদের বাড়ীতে কারও আসবার কোনও নির্দিষ্ট সময় ছিল না। যার যখন ইচ্ছে আসতেন। রান্নাবান্না হয়ে গেছে, খেতে বসব - সপরিবারে কেউ এসে গেলেন। আবার ভাত চাপাও, আবার থালা গ্লাস সাজাও। আমার অভ্যাস হয়ে গেছিলো। এখনও কোনও অসুবিধা হয় না। শ্রীপ্রীতিকুমার প্রয়াত হবার পর বাপী সবাইকে বলে দিয়েছিল সোমবার বিকেলে আসতে। আমরাও সেই মতো তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে আসতাম। ফলে সোমবার আমরা অন্য কোনও programme রাখি না। কিন্তু এখন দেখছি সব ব্যবস্থা আবার শ্রীপ্রীতিকুমারের সময়ের মতো হয়ে যাচ্ছে।

রবিবার বাপীর একটি দিন ছুটি। খুব স্বাভাবিক ভাবেই ও সোমাকে নিয়ে বেরোতে চায়। আমিও বাচেন্দ্রীকে নিয়ে দাদাদের কাছে বা দীপুর কাছে, নয়ত

অনিমার কাছে চলে যাই। কিন্তু দেখি ঠিক কেউ রবিবার এসে গেলেন। আমরা তিনজনে মুখ চাওয়া চাওয়ি করলাম। আবার রান্নাঘরে ঢুকলাম। যেদিন কেউ আসবার সম্ভাবনা নেই বলে দুপুরে একটু ঘুমাতে গেলাম - দরজায় ঠুক ঠুক। কেউ এলেন। মনে মনে তার মুণ্ডপাত করে, মুখে হাসি ফুটিয়ে বাইরের ঘরে এসে বসি। আবার পনেরো দিন বাদে বাদে মনু রবিবার এখানে আসে। অতদূর থেকে এসে ফিরে যাবে বলে বাড়ীতে থাকি। হয়তো কোনও নিমন্ত্রণও রক্ষা করলাম না - সেদিন কিন্তু কোন কারণে মনু এলো না, খবরও দিতে পারলো না। আমার বসে থাকাই সার।

ছুটির দিনগুলি নানা কাজে ঠাসা থাকে। মাসে দুমাসে একদিন শ্রীলারা না এলে আমারও ভালো লাগে না। আমার পায়ের ব্যথার জন্য আজকাল ওর কাছে যেতেও পারি না। ছুটি হলেই দৌড়ে বাড়ী পালিয়ে আসি। আজকাল একটা কাজও বেড়েছে। সেটি হল বাচেন্দ্রীকে নিয়ে বিকেলে একটু বাইরে যাওয়া। এখন আর কোর্টে যেতে হয় না –তাই অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে যাবার দরকার হয় না। তাই বাইরে যাওয়াটা প্রায় একেবারেই বন্ধ হয়েছে। মাঝে একটু ইচ্ছে হয়েছিলো গানবাজনা করি। আমার শিক্ষার ব্যাপারে বিধাতা পুরুষ একেবারেই নির্ম্মম। গানের মাষ্টার মশাইদের কাছে ক্ষমা চেয়েই বলছি ছোটবেলায় ওঁদের সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা খুব সুবিধের ছিল না। আমার বাবা আমাকে চার বছর বয়সে হারমোনিয়ম কিনে দিয়েছিলেন এবং সে যুগে সাত আট বছর বয়সে রীতিমত পণ্ডিত হতে চলেছিলাম। বিন্তু সাধনায় বাদ সাধলো এই মাষ্টার মশাইদের বিটকেলেমী। আমি কাউকে আঘাত না করেই আমার অভিজ্ঞতার থেকে বলছি।

শ্রীপ্রীতিকুমারের সংসারে এসে একটু স্থিতু হয়ে বসবার পর একজন মাষ্টার মশাই ঠিক হল, তিনি ছিলেন বিখ্যাত ইমপ্রেশারিও হরেন ঘোষের ভাই শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন ঘোষ। গুটগুট করে বুধবার আসতেন। বেশ ভালোভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীতে তালিম দিতে শুরু করলেন। দীর্ঘক্ষণ বসবার অভ্যাস আমার একেবারেই ছিল না। শেখাতে

এসে একটি গান স্বরলিপি দেখে নিজে তুলে, তারপর আমাকে তোলাতেন। ফলে অনেক সময় লাগতো। তারপর তাঁর বয়স হয়েছিল। নাকঝাড়াটা সমতালে চলছিল। হাত তো ধোওয়া হচ্ছিল না। আমার অবস্থা কাহিল। শেষে আমি আসরে দশ মিনিট থেকেই পালাতাম। শেষের দিকে দেখতাম তিনি সঙ্গে করে বেগুনি, আলুর চপ, কাটলেট নিয়ে আসছেন। ঐ নাকঝাড়া ব্যাপারটার জন্য সেটাও খেতে পারতাম না। শেষে একদিন বলে ফেললাম-"আমি আর শিখব না। আমার অসহ্য লাগছে।" উনি সেদিন সোজা শ্যামবাজারে শ্রীপ্রীতিকুমারের অফিসে গিয়ে বলেছিলেন -"রোজ ভাবি উনি ঠাটা করছেন- কিন্তু আজ মনে হোল seriously বলছেন। আমি আর শেখাতে যাব না।"

শ্রীপ্রীতিকুমার বাড়ী এসে আমাকে খুব বকেছিলেন। পরবর্তী জীবনে অবশ্য সেই সর্দিকাশী ও নাকঝাড়া নিয়ে কথা উঠলে হেসে গড়িয়ে পড়তেন। তারপর শ্রী অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে বছর চার পাঁচ যাতায়াত করেছিলাম। বিধি বাম। তিনি গোয়াবাগান থেকে ক্লাস সরিয়ে নিলেন পূর্ণদাস রোডে। অতদূরে গান শিখতে যাওয়াটা সময়সাপেক্ষ হয়ে যায় - তাই আর যাওয়া হল না।

বর্তমানে একজন শিক্ষিকার অধীনস্থ হয়েছি। তিনি গান ধরলেই আমার ফিরোজা বেগম বা অন্য কারো কথা মনে হয়। তিনি আবার ক্লাসিক্যাল বা নজরুল গীতি ছাড়া আর কিছু পছন্দ করেন না। কাজী নজরুল যে আমাদের মতো ফাঁকিবাজদের জন্য এই সর্বনাশ করে গেছেন আমার জানা ছিল না। আমার মনে হয় কোথাও গদ্য- কোথাও পদ্য, একই গানে কোথাও ঢিমে তাল - কোথাও দ্রুত তাল – কোনও লাইনে দশটি শব্দ - কোথাও চোদ্দটি। আমি চিরকাল রবীন্দ্র সঙ্গীতের মোহে আবিষ্ট। ঐ নজরুল গীতি আমার দাঁতগুলিকে নাড়িয়ে দিচ্ছে। এবারও আমি সঙ্গীতপ্রেমীদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

পুত্তর দ্বিতীয় বর্ষের তবলা পরীক্ষা দিয়ে ফেললো। তাই একটু গান নিয়ে মেতে থাকবার ইচ্ছে হয়েছিল- কিন্তু কাজী নজরুল বোধহয় আমার বৃদ্ধ বয়সে সে

ইচ্ছে পূরণ করতে দেবেন না। এখন আমার যা মানসিক অবস্থা - আমি যে কোনও মুহূর্তে সঙ্গীত বিমুখ হয়ে যেতে পারি। কারণ আর কিছু নয়। ঐ ছন্দের সঙ্গে তাল রাখতে অক্ষমতা। এমনিতেই আমার নজরুলগীতি সম্বন্ধে খুব আসক্তি ছিল না, এখন মনে হয় কি দরকার ছিল ভদ্রলোকের যা মনে হয় তাই লিখে ফেলা। তবে একটা কথা বলি। শ্যামা সঙ্গীতগুলি মনের মধ্যে কোথাও দাগ কেটে যায়। কত আকুলতা থাকলে এমন গান রচনা সম্ভব! কিন্তু আমার তো এখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা।

আমাদের বাড়ীতে আবার পর্বতারোহণের হাওয়া বইছে। বাচেন্দ্রী বড় ছোট, তাই সোমার যাওয়া হোল না। পরের বছর নিশ্চয়ই পারব। গত সাত বছরে আমরা একেবারেই অকেজো হয়েছিলাম। আমি তো একেবারেই অথর্ব হয়ে গেছি। এবার ওরা যাবে, আর আমি বাচেন্দ্রীকে রাখব। এ বাড়ীতে আরেকটা Mountaineer আমি তৈরী করে রেখে যাব। আজ যদি জুনকো আমার কাছে থাকতো তাহলে সে এ বিষয়ে পারদর্শী হতে পারতো। আমাদের দেশে বোধহয় জুনকোই প্রথম শিশু যে সাড়ে তিন বছর না হতেই পনেরো হাজার ফিট উচুতে ঠাকুমার সাথে দশদিন কাটিয়ে ছিল। সে রীতিমত ক্লাইম্বিং সু পরে ধাপে ধাপে উঠতে শিখছিলো। কি আনন্দে সে ছিল ঐ হিমালয়ের কোলে। শ্রীপ্রীতিকুমার হঠাৎ প্রয়াত হবার ফলে এ বিষয়টা তখনই ধামা চাপা পড়ে যায়। আর তো জুনকো আমার কাছে থাকে না, এবার ধরবো বাচেন্দ্রীকে। তবে তার আগে আমার ওজন কমানো দরকার। আর সেটা যে কি করে সম্ভব! .....

- - - - - - - -

(** রচনাকাল – সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩)

হিমালয়ের পার্বত্য আর্যরাই গিরি-পরিব্রাজক বা গিরিব্রজ আর্য। তাদেরই সমতলবসতির রাজধানী হচ্ছে গিরিব্রজ-রাজগৃহ। কেবল মগধেই নয়, প্রাচীন কেকয় দেশেও এমনি আর একটি গিরিব্রজ-রাজগৃহের অবস্থান সুস্পষ্টভাবে জানা যাচ্ছে। কেকয় দেশের রাজধানী গিরিব্রজ-রাজগৃহ, কানিংহামের মতে, ঝিলম নদীর তীরে বর্তমান জালালপুরের নিকট ছিল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই দুইটি গিরিব্রজ-রাজগৃহের কাছেই গিরিয়াক নামে একটি স্থান আছে; সম্ভবত গিরি-অগ্র বা গিরি-আগ।

কেকয় জাতির কথা শতপথ ব্রাহ্মণ ও ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে। কেকয় রাজা অশ্বপতির কন্যা কৈকেয়ী অযোধ্যার রাজা দশরথের পত্নী ছিলেন। পরবর্তীকালে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কেকয় অধিপতি এবং মগধের রাজগৃহের অধিপতিরা কুরুপক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। অযোধ্যার রাজা বৃহদ্বলও কুরুপক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন এবং অভিমন্যুর হাতে নিহত হয়েছিলেন। মোটকথা পূর্ব ও পশ্চিমের গিরিব্রজ রাজগৃহের মধ্যে যোগাযোগ ও সম্পর্ক ছিল। জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুসারে খৃষ্ট-পূর্ব ৩১০০ অব্দে (০ বা শূন্য কল্যব্দে) শ্রীকৃষ্ণের তিরোধান হয়েছিল এবং তাঁর ২০ বৎসর পূর্বে মহাভারতীয় কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ হয়েছিল। তদানীন্তন অযোধ্যা-রাজ বৃহদ্বলের তিরিশ পুরুষ পূর্ববর্তী রামচন্দ্রের আমল চল্লিশ শত খৃষ্টপূর্বাব্দে ধার্য করতে হয়। বোঝা গেল গিরিব্রজ রাজগৃহ তখনও ছিল।

কৈলাস ও মানস-সরোবরের এই সব গিরিব্রজ আর্যরা কেদার, বদরী ও প্রয়াগ শাখায় বিভক্ত হন। প্রয়াগ শাখা পশ্চিম থেকে পূর্বে ক্রমান্বয়ে পাঁচটি বসতি স্থাপন করেন; দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ ও বিষ্ণুপ্রয়াগ। এলাহাবাদের ত্রিবেণী সঙ্গমের প্রয়াগকে তাদেরই সমতল-বসতি গণ্য করা যায়। এলাহাবাদ-প্রয়াগের শৃঙ্গবেরপুরের নিষাদরাজ গুহ রামচন্দ্রের বন্ধু ছিলেন। কেদার শাখার পাঁচটি আদি বসতি হচ্ছে কেদারনাথ, ভিন্ন কেদারেশ্বর (শ্রীনগর-গাড়োয়াল),

গুপ্তকাশী, চতুর্থকেদার ও পঞ্চম-কেদার। হরধনুর উত্তরাধিকারী মিথিলার জনকবংশ এবং তাদের জ্ঞাতি অযোধ্যার ইক্ষ্বাকুবংশ এই কেদার শাখার আর্য। বদরী শাখার পাঁচটি আদি বসতি হচ্ছে - শুদ্ধবদরী (বদরীনারায়ণ), যোগবদরী (পাণ্ডুকেশ্বর), নৃসিংহবদরী (যোশীমঠ), চতুর্থবদরী (কুমার চটীর পথে) ও ভবিষ্যবদরী বা আদিবদরী (মেল চৌরীর পথে)।

আর্যরা যেহেতু প্রয়াগকুল, বদরীকুল ও কেদারকুলে বিভক্ত হয়েছিলেন, সেইহেতু জীবনাদর্শ সম্পর্কে তাদের ভিন্ন-ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থাকা স্বাভাবিক, তাদের স্ব স্ব ইষ্ট সম্পর্কিত ধারণার বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা এই তিনটি জীবনাদর্শ সম্পর্কে একটি প্রত্যয় লাভ করতে পারি। বৈদিক সাহিত্য থেকেই এই সব ইষ্টকে নির্বাচন করা হয়েছে এমন কথা বলা চলেনা, বরং নিজ-নিজ কুলেরই আদর্শ অনুযায়ী ধ্যানের দ্বারা আদর্শ-চরিত্র নির্মাণ করা হয়েছে এবং তাকেই ইষ্টরূপে স্থাপন করা হয়েছে। কুলেরই আদর্শ অনুযায়ী কুলের ইষ্টকে নিরামিষ কিম্বা আমিষ ভোগ দেবার ব্যবস্থা হয়েছে; কুলেরই আদর্শ বেশভূষা সেই ইষ্টের বেশ-ভূষায় ন্যস্ত হয়েছে। কিন্তু যে-কারণেই হোক প্রয়াগ কুলের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা সম্ভব হয়নি; তাদের ইষ্ট ব্রহ্মার নিত্যপুজার ক্ষেত্র এখন একমাত্র পুষ্করতীর্থ; আর কোথাও এই বিগ্রহের মন্দির নেই; সম্বৎসরের মধ্যে ব্রহ্মাপূজার কোনো তিথিও সংরক্ষিত হয়নি। কেদারকুলের ইষ্ট শিব এবং বদরীকুলের ইষ্ট নারায়ণের মন্দির দেশের সর্বত্র, নিত্যপূজাও যত্র-তত্র। এই দুইটি কুলের জীবনাদর্শ নিয়ে অনেক সংঘাত হয়েছে, রাম-রাবণের যুদ্ধ আসলে এই দুই কুলের লড়াই, কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের দুইটি পক্ষ আসলে এই দুইটি কুল কিম্বা তাদেরই দুইটি জীবনাদর্শ। এমনি অনেক সংঘাতের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত একটা সমন্বিত জীবনাদর্শ গড়ে উঠেছে।

রামচন্দ্রের একুশ পুরুষ পূর্ববর্তী ভগীরথের সময়ে গঙ্গানদী সমতলে প্রবাহিত হয়। ভগীরথেরও চৌদ্দ পুরুষ পূর্ববর্তী হরিশ্চন্দ্রের আমলে এই সমতলের গঙ্গা নিশ্চয়ই ছিলনা; তাই তদানীন্তন গঙ্গাতটবর্তী কাশীও নিশ্চয়ই সমতলের বর্তমান

কাশী হতে পারে না; অতএব তা হিমালয়ের কেদারনাথের নিকটবর্তী সেই কাশী। সেই কেদার-কাশীর সূত্রেই হরিশ্চন্দ্র প্রসঙ্গ গ্রাহ্য হয়।

এই হরিশ্চন্দ্র ছিলেন ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা ত্রস্যারুণের ত্যাজ্যপুত্র সত্যব্রত বা ত্রিশঙ্কুর পুত্র। কেদারকুলের ত্যাজ্যপুত্র সত্যব্রতকে বিশ্বামিত্র দক্ষিণে এক রাজ্য দেন - ভাগবত ও শতপথ ব্রাহ্মণ বলে, তা দ্রাবিড়রাজ্য। অযোধ্যার কেদারকুল থেকে বিতাড়িত হয়ে বিশ্বামিত্রের দ্রাবিড় রাজ্যে তার আশ্রয় পাওয়ায় বিশ্বামিত্রকে বদরীকুলের ঋষি মনে হয়। বিশেষত যখন সত্যব্রতের পুত্র হরিশ্চন্দ্রকে আবার সেই রাজা বিশ্বামিত্রকে প্রত্যর্পণ করবার পর রাজ্যের বাইরে একেবারে কেদার কাশীতে চলে যেতে হয়, তখন বিশ্বামিত্রকে ভিন্ন ধারা বদরীকুলেরই এক যুগপুরুষ মনে করতে পারি। দ্রাবিড় দেশের আলবার-সাধনাও বদরীকুলেরই ধারা। রাজা দশরথের সমকালে ৪২০২ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে চতুর্থ আলবার তিরুমলিশি দ্রাবিড় দেশে মহীসারপুরে জন্মগ্রহণ করেন, দক্ষিণাত্যের আলবারদের বিবরণীতে তাই বলা হয়। এই তিরুমলিশিকে তাঁরা বদরীনারায়ণের সুদর্শনের অবতার গণ্য করেন। তাঁরও পূর্ববর্তী তিন আলবার পরস্পর একইকালে বিদ্যমান ছিলেন বলা হয়। কিন্তু তাঁদের সঠিককাল নির্ণয় হয়নি। তাঁদের মধ্যে পোইহে কাঞ্চীনগরে, পুদত্ত মল্লাপুরীতে এবং পে ময়ুরপুরে জন্মগ্রহণ করেন। এই তিনজনকে যথাক্রমে বদরীনারায়ণের শঙ্খ, গদা ও খড়্গার অবতার গণ্য করা হয়। তাঁরা বিশ্বামিত্র এবং হরিশ্চন্দ্রের সমকালীন হলে আপত্তি করার কিছু নেই। রামচন্দ্রের আমল যদি চল্লিশ শত খৃষ্ট-পূর্বাব্দ হয় তবে তাঁর ২৮ পুরুষ পূর্ববর্তী সত্যব্রতের সমসাময়িক বিশ্বামিত্রকে প্রায় পঞ্চাশশত খৃষ্ট-পূর্বাব্দে গণ্য করতে হয়। গিরিব্রজ আর্যদের কেদারকুল ও বদরীকুল কত পূর্ববর্তী, তা এতেই ধরা পড়ে। মনে রাখতে হবে রামচন্দ্রের সমকালীন বিশ্বামিত্র দ্বিতীয় বিশ্বামিত্র এবং স্বতন্ত্র ব্যক্তি। কেদারকুলের ত্যাজ্যপুত্র সত্যব্রত যেমন বদরীকুলের আশ্রয় পেয়েছিলেন এবং তার পুত্র হরিশ্চন্দ্রকে যেমন আবার আশ্রয়চ্যুত হয়ে কেদার-কাশীতে চলে যেতে হয়েছিল, তেমনি রামচন্দ্রের আমলে আবার বদরীকুলের রাবণ হিমালয় থেকে এসে দেওঘরে কেদারকুলের আশ্রয় পেয়েছিলেন

এবং সেই আশ্রয় হারিয়ে তাঁকে পরে দক্ষিণে আলবারদের বা দক্ষিণের বদরী-কুলের মধ্যে পুনর্বাসন খুঁজতে হয়েছিল। ঘটনাগুলির মধ্যে কার্য-কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে এমনি সিদ্ধান্তের সম্মুখীন হতে হয়।

বদরীশাখা পূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্র তথা সানপো নদী বরাবর এগিয়ে যান। সদিয়ায় পরশুরাম কুণ্ড'র অবস্থান থেকে বোঝা যায় তারা ঐ পর্যন্ত পরশুরামের নায়কত্বে পৌঁচেছিলেন। বিষ্ণুধনুর উত্তরাধিকারী এই শাখা ছিলেন শ্রৌত হোম বিরোধী অর্থাৎ অহোম। এই অহোম আর্যরাই পরবর্তী কালের অহমিয়া বা অসমীয়া হতে পারেন। মিশমী পাহাড়ের মিশমীরা তো নিজেদেরকে পরশুরামের বংশধর বলেই দাবী করেন। সুবন সিঁড়ি বিভাগের আপাতানিরা নিজেদেরকে রামায়ণের বীর হনুমানের (নিশ্চয়ই বানর জাতীয় নন) বংশধর বলে দাবী করেন। লেজযুক্ত পোষাক পরা এখনও এদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। বদরীশাখার পাশাপাশি কেদারশাখাকেও দেখতে পাই। মণিপুরীরা তাদের 'লেইথক লেইখরোল' পুরাণে বলেন - মানস-সরোবর-কৈলাস থেকে শিব-পার্বতী মণিপুরের নোংমাইজিং অর্থাৎ বর্তমান নীলকণ্ঠ পর্বতে নৃত্য করতে আসেন এবং মণিধারী অনন্তনাগকে রাজ্য দিয়ে মানস সরোবরের কৈলাসে ফিরে যান। তাই রাজ্যের নাম হয় মণিপুর। কেদার-নাথ শিবের সঙ্গে তারা এমনিভাবে সম্পর্ক ঘোষণা করেন। কোচবিহারের রাজবংশ, ত্রিপুরার রাজবংশ এবং কুকীরাও নিজেদেরকে শিবের সাক্ষাৎ বংশধর বলে দাবী করেন। এরা সবাই গিরিব্রজ আর্যদের বিভিন্ন শাখা ছিলেন বলেই পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি সম্পর্ক ঘটত। লোহিত বিভাগের মিশমীদের রাজকন্যা রুক্মিনীকে শ্রীকৃষ্ণ বিয়ে করেছিলেন। তিরাপ বিভাগের নক্তেকুলের রাজকন্যা জনা, নাগা বিভাগের রাজা কৌরবের কন্যা উলুপী, মণিপুর রাজ চিত্রভানুর কন্যা চিত্রাঙ্গদাকে অর্জুন বিয়ে করেছিলেন। কাছাড় অর্থাৎ হিড়িম্বার রাজ্য ছিল ভীমের শ্বশুরালয়। কামেং বিভাগের হুরুষো আকা শাখার রাজা বাণের কনা উষাকে শ্রীকৃষ্ণের নাতি অনিরুদ্ধ বিয়ে করেছিলেন। মনে রাখতে হবে মনুসংহিতার ১০-ম অধ্যায় ৪৩-৪৪ শ্লোকে 'কিরাতা দরদা খশা' প্রভৃতি জাতিকে অনার্য বলা হয়নি, বলা হয়েছে 'ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ' আর্য।

ব্যাবিলনের সুমেরীয়দের উৎসও গিরিব্রজ আর্য। Mespero প্রণীত Struggles of Nations-এর সূচীপত্রে প্রাচীন ইরাকের উরু, কিষ, উরুক, উরুক্যাশডেম প্রভৃতি স্থানের নাম পাওয়া যায়। এই শব্দগুলি উরু, ক্ষিতি ও উরুক্ষিতির অপভ্রংশ। উরুক্ষিতি মানে বিশাল ভূমি। গিরিব্রজ আর্যরা বেলুচিস্তান ও পারস্যর পর্বতাদেশ অতিক্রম ক'রে যখন ইরাকের বিশালপ্রান্তর দেখল তখন তার নাম রাখল উরুক্ষিতি। ঋকবেদের (৭/১০০/৪) মন্ত্রে বলা হয়েছে, বিষ্ণু তাঁর অনুগতদের বাসস্থান দেবার জন্য পৃথিবী ভ্রমণ করেন। যারা তাঁকে মান্য করেন তাঁরা নিরাপদ বাসস্থান পান। বিষ্ণু উরুক্ষিতি নির্মাণ করলেন। প্রাচীন উরুক থেকেই আধুনিক নাম ইরাক হয়ে থাকবে। বিষ্ণুর সূত্রে মনে হয় সেখানে বসতি স্থাপনকারীরা বদরী-কুলের লোক ছিলেন। কেদারকুলের সংশ্রবও ছিল। কেদারনাথ শিবের গৃহিনী উমার পিতা ছিলেন হিমালয় কিন্তু মাতা মেনকা ছিলেন সুমেরু পর্বতের কন্যা। সোজা কথায় উমার পিতা হিমালয়বাসী, কিন্তু মা সুমেরীয়। Waddell তাঁর The Makers of Civilization গ্রন্থে (Preface Page xxi) খুবই স্পষ্ট ভাষায় বলছেন, 'In this regard, the staggering fact now emerges from the united testimony of the entire body of Sumerian and Babylonian monumental and literary history, as interpreted by the new official Indian Keys to the Aryan ancestry, and the traditional forms of the names of the Kings, that no semitic dynasty whatsoever is to be found in Mesopotemia throughout the whole period of recorded history from the rise of civilization downwards until the Semitic-Assyrian period of about 1200 BC.'

সুমেরীয় ও ভারতীয় রাজবংশের তুলনা-মুলক আলোচনা করে Waddell দেখিয়েছেন যে ভারত ও ব্যাবিলন একই রাজবংশ দ্বারা শাসিত হয়েছে। ইক্ষ্বাকু বংশের প্রথম রাজা ইক্ষ্বাকু এবং সুমেরীয় প্রথম রাজা উকুসি-উখু তাঁর মতে একই ব্যক্তি। এমনিভাবে ইক্ষ্বাকু বংশীয় ৬০তম উত্তর পুরুষ দশরথ হচ্ছেন সুমেরীয়

দশসি-উরস! ভারতীয় তালিকায় তিনি এদের পরম্পরা অব্যাহত দেখেছেন; কিন্তু সুমেরীয় তালিকায় ১০ম থেকে ৩৫তম পুরুষের নামগুলি নেই এবং ভারতীয় তালিকার প্রথম নয় জনকে নিয়ে প্রথম সুমেরীয় রাজবংশ এবং ৩৬ তম পুরুষ থেকে দ্বিতীয় সুমেরীয় রাজবংশ গণনা করা হয়েছে। এসব থেকে স্পষ্টতই মনে হয়, ব্যাবিলন অঞ্চল যে-কোনো কারণেই হোক ১০ তম থেকে ৩৫ তম, মোট ২৬ পুরুষের রাজত্বকালে অরাজকতার মধ্যে বাস করেছে, যদিও ভারতীয় অযোধ্যায় রাজবংশের ধারা অব্যাহতই ছিল। এর পরেও Waddell ভাবতে চেষ্টা করেছেন, সুমেরীয় অঞ্চলেই ছিল সেই রাজধানী অযোধ্যা: 'The Ayodhya city, we shall find is 'Agade' or properly Agudhu city of the Mesopotamian record.' (Page 50). আমাদের যুক্তি-বুদ্ধি এমন উল্টো সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধা দেয়। তাছাড়া এই সব রাজাদের শাসনকাল সম্পর্কে তিনি যে-সব অনুমান করেছেন, আমাদের হিসাবের সঙ্গে তা মেলে না। তাঁর মতে দশরথের পুত্র রামচন্দ্র ২১০৯ থেকে ২০৮৯ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে বিদ্যমান ছিলেন; কিন্তু আমাদের মতে এই সময়টি আরও দুই হাজার বছর পূর্ববর্তী হবে এবং সেই হিসাবে প্রথম রাজা ইক্ষ্বাকুর কাল ৩৩৭৮ থেকে ৩৩৪৯ খৃষ্ট পূর্বাব্দে না হয়ে আরও দুই হাজার বছর পূর্বে হবে।

কুশ বংশীয় গাধির পুত্র বিশ্বামিত্র সম্পর্কে তিনি বলছেন: 'Amongst these we have the Kusha line of priest kings, which contain the names of several of the Guti Viceroys, including Gudea, the Gadhi of the Indian list and his son Viswa Ratha or Vishwamitra' (Page 363)। বিশ্বামিত্রের ভগ্নিপতি উরুঋচীক প্রসঙ্গে বলছেন: 'The ur dynasty ..... was founded by the Sumerian priest urush Zikum, who had married the daughter of king Gudia the king Gadhi of the Indian Chronicles,' (Page 386) মেসোপোটেমিয়ার উর রাজবংশের উরুষ জিকুম ও আমাদের উরু ঋচীক একই ব্যক্তি। তাদের পুত্র সামুদুংগি ও জামদগ্নি এমনিভাবে অভিন্ন। আবার তাদের পুত্র পুরস সিন ও পরশুরাম সমার্থক। তাদের পুত্র সুয়াশ

সিন এবং সুসেন এমনি ভাবেই ভিন্ন নন। আবার তাদের পুত্র ইবিল সিন এবং ইল ইবিল একই ব্যক্তি এই একত্ব আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু এরা মেসোপোটেমিয়ায় এলেন কোথা থেকে? ঋকবেদ বলছে বিষ্ণু তার অনুগতদের জন্য উরুক্ষিতি নির্মাণ করেছেন। কুশ বংশ সম্পর্কে Waddel-এর বক্তব্য: 'It is significant that the first and second of these Guti kings or Viceroys were of these Kusha Line, the second, namely In Kishu or king Kishu being now shown to be the historical original of King Kusha himself of the Indian Chronicles. And Gudia himself appears as the third of these Guti Kings or Viceroys, who also bears the title of Iarla or Earl, thus disclosing his Gothic Origin.' (Page 362). কিন্তু এই শাসন কর্তাদের উৎস গথিক হলে প্রথম শাসনকর্তাই তো আর্ল উপাধি নিতেন। তা যখন হয় নি তখন তৃতীয় শাসন কর্তা স্বয়ং তার উপাধিটা নিজের শাসন-বলেই গথিক ক'রে তুলেছিলেন।

কুশ বংশ সম্পর্কে Waddell আরও বলছেন: 'Guti land, from which these invading Guti troops descended into Mesopotemia is generally placed conjecturally by Assyriologists in the high-lands of Persia to the east of Babylon. Others more correctly locate it in Kurdistan in the Eastern Taurus region, the greater part of which is within the old Hittite area.' (Page 359). কিন্তু বর্তমান তুরস্কের তরাস পর্বতশ্রেণী খৃষ্ট-পূর্ব্ব গ্রীসের ঐতিহাসিক আরিয়ান-এর বিবরণ অনুযায়ী ভারতেরই উত্তর-সীমান্ত-ভুক্ত ছিল এবং তা সাইলেশিয়া, লাইশিয়া, পম্পেলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তরাস থেকে ককেশাস এবং হিমালয়কে অবিচ্ছিন্ন ধরলেই দেখি ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত ভারতের তদানীন্তন ভূমি।

ভারতের পুরাণগুলি অনুসরণ করলে দেখা যায় যে, আওধের পুত্র নাভি এই সমগ্র ভূভাগ শাসন করতেন বলে এর নাম তখন নাভিবর্ষ ছিল; পরে নাভির

পুত্র ভরতের নামে তা ভারতবর্ষ নামে পরিচিত হয়। এই ভূভাগে নয়টি আঞ্চলিক শাসন ছিল এবং সেই সব অঞ্চলকে পৃথক পৃথক দ্বীপ বলা হত। এই নয়টি অংশের একটি অংশ ইন্দ্রদ্বীপ বর্তমানে বর্মা-থাই-ইন্দোচীন। কশেরুমান অংশটি এখন মালয়-ইন্দোনেশিয়া। তাম্রপর্ণীর অনেকটাই সমুদ্র গ্রাস করেছে, যেটুকু বাকী রেখেছে তারই নাম সিংহল। গভস্তিমান এখন সিন্ধুসাগর তথা আরবসাগরের গর্ভে গেছে। নাগদ্বীপ এখন আরব। সৌম্য আজ ইস্রাইল সিরিয়া-ইরাক-তুরস্ক। গন্ধর্ব বা গান্ধার অংশটির আয়তন হ্রাস পেয়ে আজ আফগানিস্তান হয়েছে। বরুণ অংশটি এখন ইরাণ। অবশিষ্ট অংশ কুমারী দ্বীপ এখন ভারত-পাকিস্তান-তিব্বত।

তরাস অঞ্চলের হিট্টাইটদের সম্পর্কে অবিনাশ চন্দ্র দাস তাঁর Rigvedic India গ্রন্থে বলছেন, 'It appears that the Hittties were one of the most powerful and warlike of ancient nations. The Egyptians called them Khetas and the Assyrians Khattis. From their very war like character and their name, it seems to me that they were originally an aryan tribe, belonging to the caste Ksatriyas; and Khatti, Kheta or Hittite were merely corrupted forms of the original sanskrit words." (Page 306).

আর্যভাষা যখন সতম ও কেল্টাম শাখায় বিভক্ত হয়, তখন কোনো-না-কোনো স্থানে এই দুই বর্গীয় লোকেরা এক সময় নিশ্চয়ই একত্রে বাস করত। গর্ডন চাইল্ড এই সম্পর্কে তার The Aryans গ্রন্থে বলেন, বর্তমান তুরস্কের তরাস পর্বতশ্রেণী আর্যভাষার এই দুই শাখার সীমানা হয়েছিল। সতম শাখায় ইন্দো-ইরানীয়, আলবেনীয় ও শ্ল্যাভীয় এবং কেন্টাম শাখায় গ্রীক, লাটিন, কেলটিক ও জার্মানীয় ভাষাগুলি জন্ম নিয়েছে।

বেশ বুঝতে পারছি - ভারতের মানুষ তরাসের সীমানাও ডিঙিয়েছিল।

স্মৃতিশক্তির উন্নতির উপায় কি?-

অবচেতন মন স্মৃতিশক্তির আধার। সমস্ত কর্মের ফল তথা অভিজ্ঞতা ইহার মধ্যে নিবদ্ধ থাকে। এই সকল অভিজ্ঞতা পুনরায় কাজে লাগিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহে। সচেতন মনের অন্তরালে অবচেতন মন নিদ্রাভিভূত হইয়া থাকে এবং এই নিদ্রার সময়ই ইহার কাজ হয়। চেতনাবস্থায় কাজের সময় অবচেতন মনে সঞ্চিত জ্ঞানের স্মৃতিই প্রকাশ পায়। অবচেতন মনে পূর্ব্বেকার সমস্ত অভিজ্ঞতার স্মৃতি জাগিয়া থাকে।

জাগ্রত অবস্থার কাজকর্মে অবচেতন মনের জ্ঞানের স্মৃতি প্রেরণা যোগায়। অবচেতন মনকে এমনভাবে প্রস্তুত করা যাইতে পারে যাহাতে চেতনাবস্থায় সব কাজে ইচ্ছামাত্র স্মৃতিশক্তি প্রেরণা যোগাইতে পারে। স্মৃতি হইতেছে ইচ্ছামাত্র স্মরণ করিবার শক্তি, ইহাতে কোন কাজের কর্ম কৌশলের কথা প্রতিদিন উল্লেখ করিয়া আওড়াইতে হয় না, জ্ঞানের প্রেরণা আপনা আপনি মনে জাগিয়া উঠে। স্মৃতির মাধ্যমেই আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের ব্যষ্টি জীবনের প্রবাহ চলিতেছে।

স্মৃতিশক্তি হইতেছে এমন একটি গুণ যাহা অবচেতন মনের সাহায্যে অতীতের জ্ঞানলব্ধ অভিজ্ঞতা সমূহের পুনরুদ্ধার করিয়া থাকে। সজাগ অবস্থায় স্মৃতিশক্তির সাহায্যে পূর্বলব্ধ অভিজ্ঞতা সমূহ স্মরণ করিয়া কেহ কেহ চিন্তন, মনন ও নিদিধ্যাসনের মূল্যবান উপাদান সংগ্রহ করেন। বড় বড় কাজ করিবার সময় ব্যবহারিক জীবনে স্মৃতিপ্রসূত এই সকল মূল্যবান জ্ঞান সাফল্য সূচিত করে।

স্মৃতিশক্তি সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যায়ামের আবশ্যক। হাতের অঙ্গুলির অগ্রভাগ ও অঙ্গুলির গাঁটগুলি দিয়া প্রতি সন্ধ্যায় ও সকালে মাথার সর্বত্র ও কপালে মৃদুভাবে মর্দন ও ঘর্ষণ করিবে। ইহাতে মস্তিস্ক অনেকটা সতেজ ও স্নিগ্ধ বোধ

হইবে। স্মৃতিশক্তি সম্পূর্ণ অটুট রাখিবার জন্য আহারের দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। মাদকতাময় উত্তেজক দ্রব্য সর্বপ্রকারে বর্জন করা উচিত। জ্ঞান আহরণে ও মহৎচিন্তা সমূহ মনে রাখার পক্ষে মাদক দ্রব্য ভয়ানক বিঘ্ন উপস্থিত করে, বুদ্ধিবৃত্তি ও স্মৃতিকোষ সমূহের অবনতি ঘটায়। অবিরত নেশায় বিভোর হইলে অথবা কাম-ক্রোধ-লোভের দ্বারা আক্রান্ত হইলে স্মৃতিকোষ সমূহ তাহাদের ধারণ শক্তি হারাইয়া ফেলে এবং মস্তিষ্ক অকেজো ও অলস হইয়া যায়। দেখিতে হইবে ইন্দ্রিয়াসক্তি যেন বিবেকবুদ্ধি একেবারে লুপ্ত করিয়া না দেয়। মনে রাখিবে, দেহে যত বেশী বীর্যধারণ ক্ষমতা থাকিবে, স্মৃতিশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও বিবেকজ্ঞান ততোধিক বৃদ্ধি পাইবে।

ছোট বড় সব কাজ যথাশীঘ্র তৎপরতা ও মনোযোগের সহিত সম্পন্ন করিতে হইবে। মনোযোগ যত গভীর হইবে, স্মৃতিকোষের পর্দা ততোধিক খুলিতে থাকিবে। মন স্মৃতিকোষের দপ্তরে তীক্ষ্ণ সূচের মত প্রবেশ করে। মনঃসংযম স্মৃতিশক্তির যন্ত্র বা হাতিয়ার ইহা দ্বারা স্মৃতিশক্তি জাগিয়া উঠে। যাহার মনোযোগ অল্প তাহার স্মৃতিশক্তিও ততোধিক কম। ক্রমবর্ধমান অমনোযোগ মনঃসংযমের সূঁচে মরিচা ধরাইয়া দেয়। প্রতিদিন নিদ্রার পূর্বে গত এক সপ্তাহের কাজের কথা স্মরণ কর। প্রতিমাস ও প্রতিবৎসরের শেষে পূর্বেকার ঘটনাবলী স্মরণ রাখিতে চেষ্টা কর। প্রতিমাসে ও বৎসরে তোমার জীবন সম্পর্কে; তোমার দেশ ও নগর সম্বন্ধে এবং সমগ্র পৃথিবীতে যেসব বড় বড় ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা মনে রাখিতে চেষ্টা কর।

প্রত্যেকটি কর্তব্য কর্ম প্রতিদিন নিয়মিত করিয়া যাও। রাত্রে শয়ন করিবার পূর্বে ও ভোরে নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিয়া মনে মনে সমস্ত কর্ত্তব্য কর্মের প্রতি সচেতন হও, তাহা হইলে অবচেতন মনে এগুলি সংরক্ষিত হইবে। মনের মধ্যে স্মৃতির রেখা নিবদ্ধ করিবার জন্য এই দুইটি সময় প্রধান এবং সবচেয়ে উপযোগী। আসনে উপবিষ্ট হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মনের দৃষ্টি ভ্রূ-যুগলের মধ্যবর্তী স্থানে নিবদ্ধ কর; অভ্যাস যতই দৃঢ় হইবে, দেখিবে, অতীতের সমস্ত স্মৃতি স্রোতের মত তোমার অন্তরে প্রবাহিত হইতেছে।

মানুষ ঈশ্বরের প্রতিকৃতি - ইহার তাৎপর্য কি?-

মানুষ মাত্রই মূলতঃ ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবিরূপে সৃষ্ট। কিন্তু তাহারা তাহাদের এই দিব্য জন্মের কথা ভুলিয়া গিয়াছে। কেননা, তাহারা অনেকেই তাহাদের স্বাধীন ঐশ্বরিক সত্তার অপব্যবহার করিয়াছে। মানুষ ঈশ্বরের সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি - কেবল যে সর্বশ্রেষ্ঠ জীব এমন নয়; মানুষ ঈশ্বরের সন্তান। মানুষ এই গৌরবের অধিকারী। 'মানব সন্তান' এই গৌরব রক্ষা করিবার চেষ্টা কর। ঈশ্বর তোমাদিগকে স্বাধীনভাবে ভালমন্দ বিচার করিয়া চলিবার শক্তি দিয়াছেন। তোমরা ঈশ্বরকে দূরে ঠেলিয়া রাখিতে পার, কিন্তু তিনি তোমাদিগকে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলেন না। ঈশ্বর তোমাদিগকে ইচ্ছামত জীবন গঠন করিয়া মনুষ্যত্বের বিকাশ-সাধন করিবার শক্তি দিয়াছেন। কিন্তু কখনও চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ কি, তোমার অন্তরে যে ঈশ্বরের মূর্তি বিদ্যমান তাহা কতদূর বিকৃত করিয়াছ? তোমার সোনার তরবারী যদি লোহার খাপে পুরিয়া রাখ তবে তাহা চোখে পড়বে কি? যখন তরবারী লোহার খাপ হইতে বাহির করিয়া আনিবে, তখন দেখিতে পাইবে, ইহা স্বর্ণ নির্মিত। তোমার প্রকৃত স্বরূপ, দিব্যমূর্তি সম্বন্ধেও ঐ এক কথা। আত্মা পবিত্রতার মূর্তি, স্বাধীনতা ও স্বচ্ছতার প্রতীক। তোমার আত্মাই ঈশ্বর। কিন্তু দেহের মধ্যে আত্মা সীমাবদ্ধ ও রক্ত মাংসে আবৃত। এজন্য ইহার চিরসুন্দর সত্তা তোমার চোখে পড়ে না।

যে বদভ্যাসের কারণে তোমার বর্তমান জীবন দুঃখ ক্লেশময়, তাহার জন্য ঈশ্বরকে দোষারোপ করো না। ঈশ্বর তোমাকে ঐরূপ ক্লেশ ভোগের জন্য সৃষ্টি করেন নাই। পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্মফলেই তোমার জন্ম ও বর্তমান জীবনের ক্লেশভোগ। পূর্ব জন্মের অভ্যস্ত স্বভাবের গুণেই এ জন্মের স্বভাব গঠিত। ইহা তোমারই সৃষ্ট স্বভাব। তোমার প্রকৃত স্বভাব স্বচ্ছ, সুন্দর ও নিষ্কলুষ। উহাই দিব্য স্বভাব, ঈশ্বরের মূর্তি। তোমার স্বভাবের মধ্যে যে বিকার পরিলক্ষিত হয়, তাহা তোমার সত্য রূপ নয়। তোমার খেয়াল খুশির আচরণ তোমার আত্মার স্বভাব নয়।

মনে রাখিবে, দেহ-মন-আত্মার সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য: ইহাদের সমন্বয় মূলক

শিক্ষা ও সংস্কৃতির সাহায্যে জীবন গঠন করা সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। এই সমন্বয়মূলক শিক্ষার অভাবেই মানুষের জীবনে দুঃখ ক্লেশের অবধি থাকে না। দেহ মন-আত্মার সামঞ্জস্য মূলক শিক্ষায় জ্ঞানেই চিরস্থির শান্তির পথ খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

মানব! সব সময় মনে রাখিবে, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিরূপেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। সংযম, শৃঙ্খলাবোধ, শান্তি, আনন্দ - এ সকলই তোমার প্রকৃতি স্বভাবগুণ। ক্রোধ, লোভ ইহারা তোমার প্রকৃতি স্বভাবের গুণ নহে। এগুলি মন্দ অভ্যাসের ফল। লোভ, ক্রোধ ও মোহ ইত্যাদি কারণে জীবন দুঃসহ বেদনায় জ্বলিয়া পুড়িয়া ব্যর্থ।

অহং ও আত্মার পার্থক্য কি?-

জীবাত্মা দেহাভ্যন্তরে পরমাত্মার প্রতীক; পরমাত্মার পরম পবিত্র অংশ। জীবাত্মা দেহের সঙ্গে জড়িত হইয়া থাকাকালে অহং ভাবের প্রকাশ লক্ষিত হয়। জড়বুদ্ধি জীবের অন্তরে এই অহং ভাব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তাহার চিন্তা, ধারণা, আশা ও আকাঙ্খাকে পরিচালিত করে। কামনা বাসনার প্রবৃত্তি ও আত্মিক প্রেরণার বিষয়ে বিচার করিতে হইবে। দেহজ্ঞানে জড়িত হইয়া আত্মা অহংকারের মূর্তিতে প্রকাশ পায়; মনে জাগে অসংখ্য কামনা ও লোভমোহের প্রবৃত্তি। এ সকলের দ্বারা আত্মার পবিত্রতা মলিন হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। আবার, জীবাত্মার বিশুদ্ধ স্বভাব পরিস্ফুট হইলে উহা সর্বব্যাপী অনন্ত জ্ঞানময় পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত হইয়া অনাবিল আনন্দও শান্তি বিকীরণ করিতে থাকে। কামনা বাসনার আবরণে জীবাত্মা দেহমধ্যে প্রায় অবলুপ্ত থাকে; মন অন্ধের মত সংসার পথে ঘুরিয়া বেড়ায়। জীবাত্মা সর্বানন্দ স্বরূপ সর্বব্যাপী পরমাত্মার মূর্তি। অহং ভাব ইহার বিপরীত স্বভাব। জীব অহংকার ও বলদর্পে উন্মত্ত হইলে আত্মার স্বরূপ প্রকাশিত হয় না। ইহাতে আনন্দ ও ও শান্তি বিঘ্নিত হয়।

গোদাবরীর ডাক শুনে **শ্রী অরূপ কুমার ভট্টাচার্য**

হাওড়া থেকে ফলকনুমায় হায়দ্রাবাদের পথে যেমন চিল্কার আকর্ষণ, চেন্নাই যেতে করমন্ডলে তেমনি গোদাবরী আর কৃষ্ণা নদী। করমন্ডলকেও চিল্কা দেখা দেয়, কিন্তু সে অভিসার ঘটে রাতের অন্ধকারে। গোদাবরীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ আক্ষরিক অর্থেই সাতসকালে, যখন ৭:২০ তে 'রাজামুন্দ্রি' ছেড়ে ট্রেন গোদাবরী ব্রিজে উঠে পড়ে। আর কৃষ্ণা? সে দেখা দেয় বিজয়ওয়াড়ার পরে সকাল ঠিক সওয়া দশটায়। বহুবার এপথে যাতায়াতের সুবাদে দুই নদীর ধারে দুই শহর আমাদের চোখ টেনেছে ঠিকই কিন্তু ইচ্ছেটাকে রাজামুন্দ্রির টিকিটে রূপ দিতে ২০২৬ এর জানুয়ারি পেরিয়ে গেল। ভাবতেই পারেন মাত্র ৪৪.৫ বর্গ কিলোমিটারের ছোট্ট শহর রাজামুন্দ্রি অগ্রাধিকার পেল কি ভাবে! কারণটা আর কিছুই নয়- এর ইতিহাস। জায়গার নাম রাজামুন্দ্রি হলে হবে কি তা আসলে ১০২২ সালের পূর্ব চালুক্য বংশের রাজা 'রাজারাজ নরেন্দ্র'র প্রতিষ্ঠিত 'রাজা মহেন্দ্রভরম'। চালুক্যদের পর কাকতীয়, রেড্ডিরাজা, ওড়িশার গজপতি এমনকি বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অধীনে থাকাকালীনও শহরের নামে কোন পরিবর্তন ঘটেনি। পরিবর্তন হয়নি গোলকুন্ডার কুতুবশাহী এবং হায়দ্রাবাদের নিজামের দখলে আসার পরেও। আসলে ব্রিটিশরা রাজা মহেন্দ্রভরম উচ্চারণ করতে না পেরে নাম বদলে বদলে রাখে রাজামুন্দ্রি। অবশ্য ২০১৫ সালে অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার শহরের নাম আবার পরিবর্তন করে আদিনাম 'রাজা মহেন্দ্রভরম' রেখেছে, যদিও স্টেশনের নাম এখনও RAJAHMUNDRY!

রাজামুন্দ্রিতে আমরা আশ্রয় পেয়েছিলাম স্টেশনেরই উপরতলায় এক্সিকিউটিভ রিটায়ারিং রুমে। IRCTC'র কল্যাণে এইসব ঘরের ভাড়া আর জলের দরে নেই, সার্ভিস চার্জ আর জিএসটি নিয়ে দিন প্রতি ২০২৩ টাকা। তবে ঘর আক্ষরিক অর্থেই রাজকীয় আর সার্ভিসও একেবারে 'এ' ক্লাস। তুলনায় স্টেশন রোডের হোটেলগুলো মোটেই সুবিধের নয়। তবে মহাকালেশ্বর মন্দিরের বিপরীতে অরুণা প্যালেসে থাকলে সকাল সন্ধ্যায় দেবদর্শন দর্শন হতে পারে, আর রিভার বে

রিসর্ট? রিভার ফ্রন্টের ডবলবেড ঘরগুলোর ভাড়া ৫৫০০ টাকা হলেও ভিউ একেবারে একঘর।

স্টেশনের ওপরেই ছিলাম বলে অটো অথবা গাড়ি বেছে নিয়ে রাজামুন্দ্রি শহর আর ৬৬ কিলোমিটার দূরের বন্দর শহর কাঁকিনাড়া দেখে নিতে আমাদের অসুবিধা হয়নি। সত্যি বলতে কি, পায়ে জোর থাকলে আজকের রাজামুন্দ্রির প্রধান আকর্ষণ মহাকালেশ্বর মন্দির আর গোদাবরীর প্রধান ঘাটগুলোকে পায়ে পায়েই দেখে নেওয়া যায়। তবে দ্রষ্টব্য তো স্টেশন থেকে দূরেও কিছু আছে, তাই পাঁচ-ছ'শো টাকা দিয়ে 'তাতাজী'র মত কোন অটোওয়ালাকেই (90105 36370) বেছে নেওয়া ভালো। প্রথমেই 'মহাকালেশ্বর'। স্টেশন থেকে ৭৫০ মিটারের মধ্যে যে এমন দ্বিতীয় উজ্জয়িনী তৈরী হয়েছে, সে খবর সম্ভবত ভ্রমণসঙ্গীর অন্দরে এখনও পৌঁছায়নি। তাই দর্শনে চমক তো ছিলই, তবে মন ভরে উঠেছিল তার চাইতে অনেক বেশি। ঠিক দু'বছর আগে উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বরে বাইরের শোভা দেখে যতটা মুগ্ধ হয়েছিলাম, ভিড়ের ঠেলায় দেবতার সঙ্গ তেমন ভাবে পাইনি। সেই অপূর্ণ বাসনা মেটাতেই কি দেবতা এখানে প্রতিষ্ঠিত হলেন ২০২২-এর এপ্রিলে? উজ্জয়িনীকে নকল করে তৈরী হলেও গোদাবরীকে পিছনে রেখে বিশালায়তন এই মন্দির চত্বরে দক্ষিণ ভারতের বৈশিষ্ট্য দিব্য বোঝা যায়। ভোরে ভস্মারতি দেখতে যেমন ভিড় ঠেলতে হয়না, সন্ধ্যায় প্রদীপ হাতে পূজারীদের প্রদক্ষিণে অংশ গ্রহণ করাতেও তেমনি কোন অসুবিধে নেই। সমস্যা একটাই, মূল মন্দির ঘিরে যে ৭৫টি ছোট ছোট মন্দির আছে, তা' দেখার সময় কোন অটোওয়ালা আপনাকে দেবে না। তাই অন্ততঃ আরেকবার পায়ে হেঁটে এখানে আসতেই হবে জয়পুর আর মহাবলীপুরমের গ্রানাইটে তৈরী এখানকার দেবমূর্তি দেখার জন্য।

মহাকালেশ্বর কে বাঁয়ে রেখে যে রাস্তা ক্রমশ এগিয়ে গেছে গোদাবরী ব্রিজ হয়ে পুষ্কর ঘাটের দিকে, সে পথে একটু এগিয়ে গেলেই গৌতমী ঘাট। গোদাবরীর নিজস্ব সৌন্দর্য ছাড়াও এখানকার আরেক আকর্ষণ ২০০৬ এর আগস্টে তৈরী

ইসকনের শ্রীরাধা-গোপীনাথ দশাবতার মন্দির। মন্দিরের মজাই এই যে দোতলায় উঠে তাঁকে সম্পূর্ণ প্রদক্ষিণ না করলে সব দেবতার দর্শন হবেনা। রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্তি ছাড়াও পাশেই রয়েছে পুরীর বিগ্রহের আদলে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার মূর্তি। মন্দির প্রাঙ্গন থেকেই দেখা যায় গোদাবরীর বয়ে চলা। তবে জল স্পর্শ করতে নেমে আসতেই হয় গৌতমী ঘাটের পৈঠার ওপর। নদীর দিকে মুখ করে দাঁড়ালে বাঁয়ে শিবের মন্দির, ডাইনে একটু দূরে গোদাবরী ব্রিজ। ঘাটের ওপরে রয়েছে ১৬ শতকের তেলেগু মহিলা কবি 'Atukuri Molla' (১৪৪০-১৫৩০) বা মোল্লা মামবা'র মূর্তি। 'মোল্লা রামায়ণমর' এই কবি বিখ্যাত হয়ে আছেন তেলেগু ভাষার বাল্মীকি রামায়ণ অনুবাদ করার জন্য। গৌতমী ঘাটের আরেক আকর্ষণ সেখান থেকে বিদায় বেলার সূর্য প্রত্যক্ষ করা। সে দৃশ্য অবশ্য আমরা আরেকদিন দেখেছি ৬০০ মিটার দূরের 'সরস্বতী ঘাট' থেকেও। ঘাটের প্রবেশ পথেই দেবী সরস্বতীর মন্দির, ভিতরে বিশাল ত্রিশূল, কালো পাথরের নন্দী, শিবলিঙ্গ আর ব্রিজ সমেত গোদাবরীর দৃশ্য নিয়ে শান্ত-সমাহিত পরিবেশের এই ঘাটের তুলনা মেলা ভার। সরস্বতী ঘাটের আরেক মন্দির 'Swami Ayyappa Devalaya'। স্বামী আইয়াপ্পা প্রধানত কেরালার শবরীমালা মন্দিরে পূজিত হলেও পরশুরাম প্রতিষ্ঠিত এই দেবতা পূজিত হন রাজামুন্দ্রির মন্দিরেও। শুধু সরস্বতী ঘাটেই নয়, স্বামী আইয়াপ্পার বিশাল মন্দির আমরা দেখেছি রাজামুন্দ্রি স্টেশন থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে কাঁকিনাড়ার পথে 'দোয়ারাপুরীতে'ও। রেলপথে ছোট স্টেশন Dwarapudi পার হওয়ার সময় ট্রেন থেকেই মন্দির দর্শন হয়ে যায় বটে, তবে মন্দির চত্বরে প্রবেশ না করলে বিশাল জায়গা জুড়ে যে লর্ড শিব এবং দক্ষিণ ভারতে বিরল কালী ছাড়াও নানান দেবতার মন্দির রয়েছে তা বোঝা যায়না। দোয়ারাপুরীর স্বামী আইয়াপ্পার মন্দিরকে বলা হয় অন্ধ্রপ্রদেশের শবরীমালা। প্রধান দেবতা স্বামী আইয়াপ্পার পঞ্চধাতুর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৮৯ সালে। কার্তিক মাস থেকে শুরু করে মকর সংক্রান্তি পর্যন্ত যে লক্ষ ভক্তের ভিড় জমে, জানুয়ারির শেষে স্বভাবতই সেটা ছিলনা। তাই সময়

নিয়ে দাঁড়াতে পেরেছি বিশালায়তন নটরাজ, নন্দী, শিব, গণেশ আর কালী মূর্তির সামনে।

ফিরে আসি রাজামুন্দ্রির কথায়। আইয়াপ্পা মন্দিরের পর তাতাজীর অটো আমাদের যেখানে নামিয়ে দিল সেটাই গোদাবরী ব্রিজ ভিউ পয়েন্ট। দৈর্ঘ্যে হয়তো অনেক সেতুই গোদাবরী ব্রিজকে টেক্কা দেবে, কিন্তু রোড কাম রেল ব্রিজের হিসেব করলে ৪.১ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এই সেতু আসামের BOGIBEEL (৪.৯৪ কি.মি) আর বিহারের দীঘা-শোনপুর (৪.৫৫ কিমি) ব্রিজের পরেই। তবে রাজামুন্দ্রিতে গোদাবরীর ওপর ব্রিজের সংখ্যা কিন্তু একটি নয় চারটি। তার মধ্যে ১৮৯৭ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে তৈরী হওয়া 'হ্যাভলক ব্রিজ'কে ১৯৯৭ সালে অকার্যকর বলে ঘোষণা করা হলেও ট্যুরিস্ট আকর্ষণের জন্য তাকে রেখে দেওয়া হয়েছে। পরিবর্তে সেই বছরেই চালু হয়েছে যে গোদাবরী আর্চ ব্রিজ, ক্রমের বিচারে তা তৃতীয়। দ্বিতীয়, অর্থাৎ রোড কাম রেল ব্রিজটি চালু হয়েছে ১৯৭৪ সালে। রাজামুন্দ্রির সাথে 'KOVVUR' শহর কে রেল আর সড়ক পথে যুক্ত করার কারণে এই ব্রিজ এত জনপ্রিয়। সর্বশেষ ব্রিজটি GAMMON INDIA কোম্পানী দ্বারা নির্মিত হয়েছে মাত্রই ২০১৫ সালে। চারলেনের এই রাস্তার কারণে কলকাতা-চেন্নাইয়ের সড়ক দূরত্ব অন্তত ১৫০ কিলোমিটার কমে গেছে। গোদাবরীর উপর সমান্তরাল এই চার ব্রিজকে একসাথে দেখতে হলে একবার দাঁড়াতেই হবে রাজামুন্দ্রির বিখ্যাত 'পুষ্কর ঘাটে'। সেই পুষ্কর ঘাট, যেখানে প্রয়াগরাজ অথবা হরিদ্বারের কুম্ভমেলার মত 'গোদাবরী পুষ্করম' অর্থাৎ ওয়ারশিপ অফ গোদাবরী উপলক্ষে মেলা বসে প্রতি ১২ বছর অন্তর। ২০১৫ সালের আগস্টে শেষ বার এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে, স্বাভাবিক ভাবেই পরবর্তী উৎসবের দিন নির্দিষ্ট হয়েছে ২০২৭-এর ২৩শে জুলাই থেকে ৩'রা আগস্ট। তবে ২০১৫-র মেলা কিন্তু অন্যান্য বারের মত ছিলনা, তা ছিল ১৪৪ বছর অন্তর ঘটা গোদাবরী মহাপুষ্করম বা গ্রেট ওয়ারশিপ অফ দ্য গোদাবরী রিভার। খবর নিয়ে জেনেছি গুগুলও তা সমর্থন করেছে। সেই মহামেলায় ভক্ত সমাগম হয়েছিল প্রায় ১১ কোটি। পুষ্কর ঘাটের আরেক আকর্ষণ 'কোটি লিঙ্গেশ্বর' মন্দিরের সন্ধ্যারতি।

তাছাড়া নানান যাগযজ্ঞ, পারলৌকিক ক্রিয়া, ভক্ত সমাগম - সব মিলে অপরাপর ঘাটের তুলনায় একটু অপরিষ্কার হলেও সকাল থেকে সন্ধ্যায় পুষ্কর ঘাট জমজমাট।

কাছেই মার্কণ্ডেয় স্বামীর মন্দির। জনশ্রুতি, গোদাবরীর কাছের এই মন্দির স্বয়ং ঋষি মার্কণ্ডেয় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানের মন্দিরটি অবশ্য ২০১৮ সালে VADDE SOBHANADREESWARA RAO পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। শিবের (মার্কণ্ডেয়) প্রধান মন্দির ছাড়াও এখানে রয়েছে পার্বতী, গণেশ, শনিদেব, আইয়াপ্পা এবং নবগ্রহের মন্দির।

রাজামুন্দ্রি স্টেশন থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার দক্ষিণে এখানকার আর এক দ্রষ্টব্য ২.৯৩ হাজার মেট্রিক টন স্টোরেজ ক্যাপাসিটির গোদাবরী ব্যারেজ। Dowleswaram অঞ্চলে ৩৫৯৯ মিটার দৈর্ঘ্যের এই বাঁধের আজকের নাম অবশ্য স্যার আর্থার কটন ব্যারেজ। স্বাভাবিক, কারণ ১৮৫২ সালে এই সাহেবের হাত ধরেই তো গোদাবরী নদীর শেষাংশে তৈরী হয়েছিল এই ব্যারেজ। কৃষি ও জল সরবরাহের উদ্দেশ্যে নির্মিত এই বাঁধের কার্যকারিতা বুঝতে পারি যখন দেখি বার্ষিক ১২০ লক্ষ টন ধান উৎপাদন করে আজ সে তৃতীয় উৎপাদনকারী রাজ্য! এই উপযোগিতা ধরে রাখতে ব্যারেজের পুরানো কাঠামোতে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে ১৯৭০ সালে রেট্রোফিটিং করা হয়েছে। রাস্তার একপাশে আর্থার কটনের স্ট্যাচু নিয়ে বাঁধ এখন ট্যুরিস্টদের কাছে আরও আকর্ষণীয়।

এবার আসি বিশাখাপত্তনমের মতই আরেক গভীর জলের বন্দর শহর কাঁকিনাড়ার কথায়। বন্দরে পা রাখার সুযোগ অবশ্য ছিলনা, তাই ফিশিং হারভারে ঘুরেই যে দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে হবে সেটা জানতাম। আর কাঁকিনাড়ার আসল আকর্ষণ তো তার সমুদ্র সৈকত। সুরেশের (99086 60056) আই-টেন ৭/৮ ঘন্টার ড্রাইভে তা দিব্য দেখিয়েছিল। প্রসঙ্গত বলে রাখি এই ভ্রমণের খরচ কিন্তু দু'হাজার টাকার বেশি হতে পারেনা, কিন্তু নতুন চিড়িয়া দেখেই হয়তো প্রথম দিন গাড়িওয়ালারা হেঁকে ছিল পাঁচ হাজার! শেষ পর্যন্ত সুরেশের আড়াই হাজারে আমরা

রাজি হয়েছিলাম একটাই শর্তে - পথে দোয়ারপুরীর আইয়াপ্পা মন্দিরে অন্তত আধ ঘন্টা সময় দেবে। মন্দির পর্ব শেষ হতেই গাড়ি সেই যে ছুটলো, তা শেষ হলো একেবারে বঙ্গোপসাগরের ওপরে 'KAUDA' বীচ পার্কের সামনে। ১.১ কিলোমিটারের মধ্যেই রয়েছে কাঁকিনাড়া বীচ ও। সামনে সমুদ্রের হাতছানি, আর দু' দিকে আইসক্রিম, বাদামভাজা আর ঝালমুড়ির লোভানি। ঢেউ এর উচ্ছ্বাস যখন দেহে আনে যৌবনের উন্মাদনা, তখন কি মন জিভের কথা শোনে? ইচ্ছে থাকলেও গিন্নীর চোখের ইঙ্গিত উত্তাল ঢেউদের আলিঙ্গনে ধরা পড়তে দেয়নি, তবে পরশের রোমাঞ্চে আর বাধা দেবে কে? কাঁকিনাড়া অথবা কাউডা বীচ - কোথাও কিন্তু দীঘা - পুরী অথবা কন্যাকুমারীর ভিড় চোখে পড়েনি। নিরালা সৈকতের স্কুটার রাইড হয়তো ছুটির দিনে মাতিয়ে তোলে, কিন্তু আমাদের মতো সিনিয়র সিটিজেনদের সব ছুটির দিনে সেখানে হাতে গোনা লোকের বেশি কেউ ছিলনা। কাউডা বীচ থেকে ন' কিলোমিটার বেশিটা উত্তরে অল্প পূবে যেতে পারলে কাঁকিনাড়ার আরেক বীচ 'UPPADA'-র সৌন্দর্য শুধু নয়, দেখা যেত এই কোস্টাল ভিলেজের অসাধারন হাল্কা সিল্ক আর কটন হ্যান্ডলুম শাড়িও। কিন্তু কাঁকিনাড়া ফিসিং হারবারের টান আমাদের নিয়ে চলল উল্টোদিকে - পাঁচ কিলোমিটার দক্ষিণে। ফিশিং হারবার মানেই বেশ কিছু জেটি, সারি সারি ট্রলার, মাছের জাল আর শুকাতে দেওয়া মাছ। এর সাথে উপরি পাওয়া দূরের বন্দর আর খাঁড়ির সাথে সমুদ্রের মেলামেশার দৃশ্য। তবে এত দূরে এসেও যে বন্দরকে রক্ষাকারী ন্যাচারাল ব্যারিয়ার ১৬ কিলোমিটার লম্বা বালিয়াড়ির 'হোপ আইল্যান্ড' দেখা হলোনা, সে আফসোস আমাদের রয়েই গেল। আর দেখা হলোনা রাজামুন্দ্রির ৯৭.৫ কিলোমিটার দূরে Antarvedi-তে গোদাবরী সঙ্গম বা 'দক্ষিণা কাশী'। তবে গোদাবরীর উৎপত্তি স্থল পশ্চিমঘাট পর্বতমালার ত্র্যম্বকেশ্বর তথা ব্রহ্মগিরি যখন দেখেছি, তখন বঙ্গোপসাগরে মিশে যাওয়ার আগে যতই সে অখণ্ড নদী গৌতমী, বশিষ্ঠ, কৌশিকী ইত্যাদি সপ্তধারায় বিভক্ত হোক না কেন, ভবিষ্যতে সবকটি মোহনা আমরা দেখবই।

সরস্বতী ঘাট, রাজমুন্দ্রী

মহাকালেশ্বর মন্দির, রাজামুন্দ্রী

ইসকনের রাধা গোপীনাথ মন্দির

পুষ্কর ঘাট থেকে আর্চ ব্রীজ

ফিশিং হারবার, কাঁকিনাড়া

গৌতমী ঘাটে মোল্লামাম্বা

লর্ড শিব, দ্বারপুরী

মহাকালেশ্বর, রাজমুন্দ্রী